أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ
يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ ۖ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴿٨١﴾
سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾
فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ
وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ
يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ
يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾
فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

سورة الدخان مكية وهي تسع وخمسون اية وثلث ركوعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

حٰمٓ ﴿١﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ
إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٣﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾

৮০) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শ শুনি না? হাঁ, শুনি। আমার ফেরেশতাগণ তাদের নিকটে থেকে লিপিবদ্ধ করে। (৮১) বলুন, দয়াময় আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকলে আমি সর্ব প্রথম তার এবাদত করব। (৮২) তারা যা বর্ণনা করে, তা থেকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা, আরশের পালনকর্তা পবিত্র। (৮৩) অতএব, তাদেরকে বাকচাতুরী ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দিন সেই দিবসের সাক্ষাত পর্যন্ত, যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়। (৮৪) তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে এবং তিনিই উপাস্য ভূমণ্ডলে । তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (৮৫) বরকতময় তিনিই, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যার। তাঁরই কাছে আছে কেয়ামতের জ্ঞান এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৮৬) তিনি ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে, তারা সুপারিশের অধিকারী হবে না, তবে যারা সত্য স্বীকার করত ও বিশ্বাস করত। (৮৭) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্। অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (৮৮) রসূলের এই উক্তির কসম, হে আমার পালনকর্তা, এ সম্প্রদায় তো বিশ্বাস স্থাপন করে না। (৮৯) অতএব ,আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং বলুন, 'সালাম' । তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

সূরা আদ দোখান
মক্কায় অবতীর্ণ, ঃ আয়াত ৫৯

(১) হা-মীম (২) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের (৩) আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। (৪) এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।

উভয় দিক বিচারে উৎকৃষ্ট বন্ধুত্ব তাই, যা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হয়। যে দু'জন মুসলমানের মধ্যে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বন্ধুত্ব হয়, তাদের ফযীলত ও মহত্ত্ব অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হাশরের ময়দানে তারা আল্লাহ্‌র আরশের ছায়াতলে থাকবে। 'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে' বন্ধুত্বের অর্থ অপরের সাথে কেবল সত্যিকার ধর্মপরায়ণতার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা। সেমতে ধর্মীয় শিক্ষার ওস্তাদ, শায়েখ, মুর্শিদ, আলেম ও আল্লাহ্‌ভক্তদের প্রতি এবং সারা মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি নিঃস্বার্থ মহব্বত পোষণ করা এর অন্তর্ভুক্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ –(যদি রহমান আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকত, তবে আমিই সর্বপ্রথম তার এবাদত করতাম)। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্‌র সন্তান হওয়া কোন পর্যায়ে সম্ভব। বরং উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আমি কোন শত্রুতা ও হঠকারিতাবশতঃ তোমাদের বিশ্বাস অস্বীকার করছি না ; বরং প্রমাণাদির আলোকেই করছি। বিশুদ্ধ প্রমাণাদি দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তান থাকা প্রমাণিত হলে আমি অবশ্যই তা মেনে নিতাম। কিন্তু সর্বপ্রকার দলীল এর বিপক্ষে। কাজেই মেনে নেয়ার প্রশ্নই উঠে না। এ থেকে জানা গেল যে, মিথ্যাপন্থীদের সাথে বিতর্কের সময় নিজের সত্যপ্রিয়তা ফুটানোর উদ্দেশ্যেএকথা বলা জায়েয ও সমীচীন যে, তোমার দাবী সত্য প্রমাণিত হলে আমি মেনে নিতাম। কেননা, মাঝে মাঝে এধরনের কথায় প্রতিপক্ষের মনে নম্রতা সৃষ্টি হয়, যা তাকে সত্য গ্রহণে উৎসাহিত করে।

وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ – এ বাক্যটি অবতারণার উদ্দেশ্য কাফেরদের উপর গযব নাযিল হওয়ার যে বহুবিধ গুরুতর, অপরদিকে 'রহমতুল্লিল-আলামীন' ও শফীউল মুযনিবীন' রূপে প্রেরিত রসূল (সাঃ) স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং বলছেন যে, তারা বার বার বলা সত্ত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করে না। এখন অনুমান করা যায় যে, তারা রসূল (সাঃ)-এর উপর কি পরিমাণ নির্যাতন চালিয়েছে। মামুলী কষ্ট পেয়ে রহমতুল্লিল আলামীন (সাঃ) আল্লাহ্ তাআলার কাছে এমন বেদনা মিশ্রিত অভিযোগ করতেন না। এ তফসীর অনুযায়ী وَقِيلِهِ এর এক আয়াত পূর্বে السَّاعَةُ শব্দের উপর معطوف হয়েছে। এ আয়াতের আরও কয়েকটি তফসীর করা হয়েছে। উদাহরণতঃ واو অক্ষরটি কসমের অর্থ বোঝায় এবং إِنَّ هَٰؤُلَاءِ কসমের জওয়াব। এসব তফসীর রুহুল মা'আনীতে দ্রষ্টব্য।

وَقُلْ سَلَامٌ –পরিশেষে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, বিরোধীদের দলীল ও আপত্তির জওয়াব দিন, কিন্তু তারা অজ্ঞতা ও মূর্খতা প্রদর্শনে কিংবা দুর্নাম রটনায় প্রবৃত্ত হলে তার জওয়াব তাদের ভাষায় না দিয়ে নিশ্চুপ থাকুন। 'সালাম বলুন'–এর অর্থ আসসালামু আলাইকুম বলা নয়। কেননা, কোন অমুসলিমকে এই ভাষায় সালাম করা বৈধ নয়। বরং এটা এক বাকপদ্ধতি। কারও সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হলে বলা হয়, 'আমার পক্ষ থেকে সালাম' অথবা 'তোমাকে সালাম করি।' এতে সত্যিকারভাবে সালাম উদ্দেশ্য থাকে না, বরং উদ্দেশ–এই যে, আমি সুন্দরভাবে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই। কাজেই এ আয়াত দ্বারা কাফেরদেরকে السلام عليكم বলা অথবা سلام বলা বৈধ প্রতিপন্ন করা অসঙ্গত। —(রুহুলমা'আনী)

সূরা যুখরুফ সমাপ্ত

সূরা আদ দোখান

সূরার ফযীলত ঃ হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জুমাআর রাত্রিতে সূরা দোখান পাঠ করে, সকাল হওয়ার আগেই তার গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। হযরত আবু উমামার রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি জুমআর রাত্রিতে অথবা দিনে সূরা দোখান পাঠ করবে আল্লাহ্ তাআলা তার জন্যে জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করবেন।—(কুরতুবী)

উল্লেখিত আয়াতসমূহে কোরআনের মাহাত্ম্য ও কতিপয় বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (সুস্পষ্ট কিতাব) বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কসম করে বলেছেন, আমি একে এক মোবারক রাত্রিতে নাযিল করেছি এবং এর উদ্দেশ্য গাফেল মানুষকে সতর্ক করা।

لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ –অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে শবে-কদর বোঝানো হয়েছে, যা রমযান মাসের শেষ দশকে হয়। এ রাত্রিকে 'মোবারক' বলার কারণ এই যে, এ রাত্রিতে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অসংখ্য কল্যাণ ও বরকত নাযিল হয়। সূরা কদরে إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ –আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন পাক শবে-কদরে নাযিল হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, এখানেও বরকতের রাত্রি বলে শবে-কদরই বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেন, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা পয়গম্বরগণের প্রতি যত কিতাব নাযিল করেছেন, তা সবই রমযান মাসেরই বিভিন্ন তারিখে নাযিল হয়েছে। হযরত কাতাদাহ্ বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফাসমূহ রমযানের প্রথম তারিখে, তওরাত ছয় তারিখে, যবুর বার তারিখে, ইঞ্জীল আঠার তারিখে এবং কোরআন পাক চব্বিশ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর পঁচিশের রাত্রিতে অবতীর্ণ হয়েছে।—(কুরতুবী)

কোরআন শবে-কদরে নাযিল হয়েছে, এর অর্থ এই যে, লওহে-মাহফুয থেকে সমগ্র কোরআন দুনিয়ার আকাশে এ রাত্রিতেই নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর তেইশ বছরে অল্প অল্প করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রতি বছর যতটুকু কোরআনের অবতরণ অবধারিত ছিল, ততটুকুই শবে-কদরে দুনিয়ার আকাশে নাযিল করা হত।– (কুরতুবী)

ইকরিমাহ্ প্রমুখ কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াতে বরকতের রাত্রি বলে শবে-বরাত অর্থাৎ, শা'বান মাসের পনের তারিখের রাত্রি বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এ রাত্রিতে কোরআন অবতরণ কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনার পরিপন্থী।

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ এবং شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ এর ন্যায় সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও বলা যায় না যে, কোরআন শবে-বরাতে নাযিল হয়েছে। তবে কোন কোন রেওয়ায়েতে শা'বানের পনের তারিখকে শবে-বরাত অথবা 'লায়লাতুস্‌সফ' নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং এর বরকতময় হওয়া ও এতে রহমত নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে কোন কোন রেওয়ায়েতে রহমত নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا এ রাত্রিতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা আমার পক্ষ থেকে করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ কোরআন অবতরণের রাত্রি অর্থাৎ, শবে-কদরে সৃষ্টি সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা স্থির করা হয়, যা পরবর্তী শবে-কদর পর্যন্ত এক বছরে সংঘটিত হবে। অর্থাৎ, এ বছর কারা কারা জন্মগ্রহণ করবে, কে কে মারা যাবে এবং এ বছর কি পরিমাণ রিযিক দেয়া হবে। মাহ্‌দভী বলেন, এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরে পূর্বাহ্নে স্থিরীকৃত সকল ফয়সালা এ রাত্রিতে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে অর্পণ করা হয়। কেননা, কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তাআলা এসব ফয়সালা মানুষের জন্মের পূর্বেই সৃষ্টিলগ্নে লিখে দিয়েছেন। অতএব, এ রাত্রিতে এগুলোর স্থির করার অর্থ এই যে, যে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ফয়সালা ও তকদীর প্রয়োগ করা হয়, এ রাত্রিতে সারা বছরের বিধানাবলী তাদের কাছে অর্পণ করা হয়।—(কুরতুবী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে শবে-বরাত সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, এতে জন্ম-মৃত্যুর সময় ও রিযিকের ফয়সালা লেখা হয়। এ থেকেই কেউ কেউ আলোচ্য আয়াতে 'বরকতের রাত্রি'র অর্থ নিয়েছেন শবে-বরাত। কিন্তু এটা শুদ্ধ নয়। কেননা, এখানে সর্বাগ্রে কোরআন অবতরণের উল্লেখ রয়েছে এবং কোরআন অবতরণ যে রমযান মাসে হয়েছে, তা কোরআনের বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত। শবে-বরাত সম্পর্কিত উল্লেখিত কোন কোন রেওয়ায়েতকে ইবনে-কাসীর অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং কাযী আবুবকর ইবনে আরাবী সংশ্লিষ্ট বর্ণনাগুলোর 'নির্ভরযোগ্য নয়' বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনে আরবী শবে-বরাতের ফযীলত স্বীকার করেন না। তবে কোন কোন মাশায়েখ দুর্বল হলেও হাদীসগুলোকে কবুল করেছেন। কেননা, ফযীলত সম্পর্কিত দুর্বল রেওয়ায়েত কবুল করার অবকাশ রয়েছে।

أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝٥ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝٦ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنْ
كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ۝٧ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ
الْأَوَّلِينَ ۝٨ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَّلْعَبُونَ ۝٩ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ
بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝١٠ يَّغْشَى النَّاسَ ۖ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝١١ رَبَّنَا اكْشِفْ
عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۝١٢ أَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ
رَسُولٌ مُّبِينٌ ۝١٣ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ۝١٤ إِنَّا
كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ ۝١٥ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ
الْكُبْرٰى ۚ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ۝١٦ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ
جَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۝١٧ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ
أَمِينٌ ۝١٨ وَأَنْ لَّا تَعْلُوا عَلَى اللّٰهِ ۖ إِنِّي اٰتِيكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝١٩ وَإِنِّي
عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ۝٢٠ وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ۝٢١
فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ۝٢٢ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا
إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ۝٢٣ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ۝٢٤
كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُونٍ ۝٢٥ وَّزُرُوعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝٢٦

(৫) আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে, আমিই প্রেরণকারী, (৬) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৭) যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে দেখতে পাবে ; তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা। (৮) তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষদেরও পালনকর্তা (৯) এতদসত্ত্বেও এরা সন্দেহে পতিত হয়ে ক্রীড়া-কৌতুক করছে। (১০) অতএব আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধূয়ায় ছেয়ে যাবে, (১১) যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। এটা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১২) হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করুন, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করছি। (১৩) তারা কি করে বুঝবে, অথচ তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল (১৪) অতঃপর তারা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং বলে, সে তো উন্মাদ—শিখানো কথা বলে। (১৫) আমি তোমাদের উপর থেকে আযাব কিছুটা প্রত্যাহার করব, কিন্তু তোমরা পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। (১৬) যেদিন আমি প্রবলভাবে ধৃত করব, সেদিন পুরোপুরি প্রতিশোধ গ্রহণ করবই। (১৭) তাদের পূর্বে আমি ফেরাউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের কাছে আগমন করেছেন একজন সম্মানিত রসূল, (১৮) এই মর্মে যে, আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আমার কাছে অর্পণ কর। আমি তোমাদের জন্য প্রেরীত বিশ্বস্ত রসূল (১৯) আর তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না। আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করছি। (২০) তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরবর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জন্যে আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার শরণাপন্ন হয়েছি। (২১) তোমরা যদি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে আমার কাছ থেকে দূরে থাক। (২২) অতঃপর সে তার পালনকর্তার কাছে দোয়া করল যে, এরা অপরাধী সম্প্রদায় (২৩) তাহলে তুমি আমার বন্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিবেলায় বের হয়ে পড়। নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (২৪) এবং সমুদ্রকে অচল থাকতে দাও। নিশ্চয় ওরা নিমজ্জিত বাহিনী। (২৫) তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবন, (২৬) কত শাস্যক্ষেত্র ও সুরম্য স্থান,

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লেখিত ধূঁয়া সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। প্রথম উক্তি এই যে, এটা কেয়ামতের অন্যতম আলামত বা কেয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে। এই উক্তি হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, আবু হুরায়রা, (রাঃ) হাসান বসরী (রহঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী অতীতে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এতে মক্কার সে দুর্ভিক্ষ বোঝানো হয়েছে, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বদ-দোয়ার ফলে মক্কাবাসীদের উপর অর্পিত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল এবং মৃত জন্তু পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। আকাশে বৃষ্টি ও মেঘের পরিবর্তে ধূম্র দৃষ্টিগোচর হত। এ উক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রমুখের। তৃতীয় উক্তি এই যে, এখানে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কার আকাশে উত্থিত ধূলিকণাকে ধূম্র বলা হয়েছে। এ উক্তি আবদুর রহমান আরাজ প্রমুখের।—(কুরতুবী) প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ই সমধিক প্রসিদ্ধ। তৃতীয় উক্তি ইবনে-কাসীরের মতে অগ্রাহ্য। সহীহ্ হাদীসসমূহে দ্বিতীয় উক্তিই অবলম্বিত হয়েছে। প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ের রেওয়ায়েত নিম্নরূপ ঃ

সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হুযায়ফা ইবনে উসায়েদ বলেন, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উপর তলার কক্ষ থেকে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। আমরা তখন পরস্পর কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, যত দিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ, ততদিন কেয়ামত হবে না—(১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (২) দোখান তথা ধূম্র, (৩) দাব্বা, (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আর্বিভাব, (৫) ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ, (৬) দাজ্জালের অবির্ভাব, (৭) পূর্বে ভূমিধস, (৮) পশ্চিমে ভূমিধস (৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধস, (১০) আদন থেকে এক অগ্নি বের হবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষ যেখানে রাত্রিযাপন করতে আসবে, অগ্নিও থেমে যাবে, যেখানে দুপুরে বিশ্রামের জন্যে আসবে, সেখানে অগ্নিও থেমে যাবে।—(ইবনে-কাসীর)

আবু মালেক আশ'আরী বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আমি তোমাদেরকে তিন বিষয়ে সতর্ক করছি— (এক) ধূম্র, যা মুমিনকে কেবল এক প্রকার সর্দিতে আক্রান্ত করে দেবে এবং কাফেরের দেহে প্রবেশ করে প্রতিটি রন্ধ্রপথে বের হতে থাকবে। (দুই) দাব্বা (ভূগর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভুত জানোয়ার) এবং (তিন) দাজ্জাল। ইবনে-কাসীর এমনি ধরনের আরও কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেন ঃ কোরআনের তফসীরকার হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) পর্যন্ত এই সনদ বিশুদ্ধ। অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তিও তাই, তারা ইবনে -আব্বাসের সঙ্গে একমত হয়েছেন। এছাড়া কিছু সহীহ্ ও হাসান হাদীসও একথা প্রমাণ করে যে, 'দোখান' ধূম্র কেমামতের ভবিষ্যৎ আলামতসমূহের অন্যতম। কোরআনের বাহ্যিক ভাষাও এর সাক্ষ্য দেয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের তফসীরে উল্লেখিত ধূম্র একটি কাল্পনিক ধূম্র ছিল, যা ক্ষুধার তীব্রতার কারণে তাদের চোখে প্রতিভাত হয়েছিল। এর জন্যে 'মানুষকে ঘিরে নেবে' কথাটি অবান্তর মনে হয়। কেননা, এই কাল্পনিক ধূম্র মক্কাবাসীদের মধ্যেই সীমিত ছিল। অথচ يَّغْشَى النَّاسَ থেকে বোঝা যায় যে, এটা সব মানুষকে ব্যাপকভাবে ঘিরে ফেলবে।' (ইবনে কাসীর)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের উক্তির রেওয়ায়েত বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবে হযরত মসরূকের বাচনিক বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন আমরা আবওয়াবে কেন্দার নিকটবর্তী কূফার মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, জনৈক ওয়ায়েয ওয়াজ করছেন।

তিনি يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ – আয়াত সম্পর্কে শ্রোতাদেরকে প্রশ্ন করলেন, এই দোখানের কি অর্থ, আপনারা জানেন? অতঃপর নিজেই বললেন, এটা এক ধূম্র, যা কেয়ামতের দিন নির্গত হবে এবং মুনাফিকদের কর্ণ ও চক্ষু নষ্ট করে দেবে। পক্ষান্তরে মুমিনদের মধ্যে এর কারণে কেবলমাত্র সর্দির উপসর্গ সৃষ্টি হবে।

মসরূক বলেন, ওয়ায়েযের একথা শুনে আমরা আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের কাছে গেলাম। তিনি শায়িত ছিলেন—ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের নবীকে (সাঃ)–এই পথনির্দেশ দিয়েছেন — مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ –অর্থাৎ, আমি তোমাদের কাছে আমার সেবা কর্মের 'কোন বিনিময় চাই না এবং আমি কোন কথা বানিয়ে বলি না। কাজেই যে আলেম হবে, সে যা জানে না, তা পরিষ্কার বলে দেবে, আমি জানি না; আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। নিজে কোন কথা বানিয়ে বলা উচিত নয়। অতঃপর তিনি বললেন, এখন আমি তোমাদেরকে এ আয়াতের তফসীর সম্পর্কিত ঘটনা শুনাই। কাফেররা যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর দাওয়াতে কবুল করতে অস্বীকার করল এবং কুফুরীকেই আঁকড়ে রইল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের জন্যে বদদোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ্ এদের উপর ইউসুফ (আঃ)–এর আমলের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিন। ফলে কাফেররা ভয়ংকর দুর্ভিক্ষে পতিত হল। এমনকি, তারা অস্থি এবং মৃত জন্তুও ভক্ষণ করতে লাগল। তারা আকাশের দিকে তাকালে ধূম্র ব্যতীত কিছুই দৃষ্টিগোচর হত না। এক রেওয়ায়েতে আছে, তাদের কেউ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার তীব্রতায় সে কেবল ধূম্রের মত দেখত। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ –আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর কাছে আবেদন করল, আপনি আপনার মুযার গোত্রের জন্য আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টি দোয়া করুন! নতুবা আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দোয়া করলে, বৃষ্টি হল। তখন إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ আয়াত নাযিল হল। অর্থাৎ, আমি কিছু দিনের জন্যে তোমাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। কিন্তু তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে গেলে আবার কুফরের দিকে ফিরে যাবে। বাস্তবে তাই হল, তারা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। তখন আল্লাহ্ তাআলা يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ –আয়াত নাযিল করলেন। অর্থাৎ যেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিনের ভয় কর। অতঃপর ইবনে-মসউদ বললেন, এই প্রবল পাকড়াও বদরযুদ্ধে হয়ে গেছে। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আরও বললেন, পাঁচটি বিষয় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ, দোখান তথা ধূম্র, রোম, চাঁদ, পাকড়াও ও লেযাম।— (ইবনে-কাসীর) দোখান অর্থ মক্কার দুর্ভিক্ষ। রোম অর্থ সেই ভবিষ্যদ্বাণী যা সূরা রূমে রোমকদের বিষয় সম্পর্কে বর্ণিত আছে وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ –চন্দ্র অর্থ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, যা اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। পাকড়াও অর্থ বদরযুদ্ধে কোরাইশ কাফেরদের পরিণতি। লেযাম অর্থে فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাওয়া যায়—(১) আকাশে ধূম্র দেখা দেবে এবং সবাইকে আচ্ছন্ন করবে, (২) মুশরেকরা আযাবে অতিষ্ঠ হয়ে ঈমানের ওয়াদা করতঃ আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবে, (৩) তাদের ওয়াদা মিথ্যা প্রমাণীত হবে এবং পরে তারা বে-ঈমানী করবে, (৪) তাদের মিথ্যা ওয়াদা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে জব্দ করার উদ্দেশে কিছু দিনের জন্যে আযাব প্রত্যাহার করবেন এবং বলে দেবেন, তোমরা ওয়াদায় কায়েম থাকবে না এবং (৫) আল্লাহ্ তাআলা পুনরায় তাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করবেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের তফসীর অনুযায়ী সবগুলো ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথমোক্ত চারিটি মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হওয়া এবং তা দূর হওয়ার অন্তবর্তী সময়েই পূর্ণ হয়েছে এবং পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণীটি বদর যুদ্ধে পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু এই তফসীর কোরআনের বাহ্যিক ভাষার সাথে সঙ্গতি রাখে না। কোরআনের ভাষা থেকে বোঝা যায় যে, আকাশ প্রকাশ্য ধুঁয়া দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং সমস্ত মানুষ এই ধূম্র দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে। কিন্তু তফসীর থেকে এগুলো কিছুই প্রমাণিত হয় না। বরং জানা যায় যে, এই ধূম্র তাদের বিপদের তীব্রতার ফলশ্রুতি। এ কারণেই ইবনে-কাসীর কোরআনের বাহ্যিক ভাষা দৃষ্টে এ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এ ধূম্র কেয়ামতের অন্যতম আলামত। একে অগ্রাধিকার দেয়ার আরও কারণ এই যে, এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর উক্তি দ্বারা প্রমাণীত। পক্ষান্তরে ইবনে মসউদের তফসীর তাঁর নিজস্ব ধারণাপ্রসূত। কিন্তু ইবনে-কাসীরের অগ্রাধিকার দেয়া তফসীরে বাহ্যতঃ খটকা আছে। তা এই যে, আয়াতে আছে إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ –অথচ কেয়ামতে কাফেরদের থেকে কোন সময় আযাব প্রত্যাহার করা হবে না। সুতরাং কিছু দিনের জন্যে আযাব প্রত্যাহারের বিষয়টি কিরূপে শুদ্ধ হবে? ইবনে-কাসীর বলেন, এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে (এক) উদ্দেশ্য এই যে, আমি যদি তোমাদের কথা অনুযায়ী আযাব প্রত্যাহার করি এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেই, তবে তোমরা পূর্ববৎ কুফরীই করতে থাকবে।

কোরআনের অন্য আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

–অন্য এক আয়াতে আছে وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, كشف عذاب –এর মানে যদিও আযাবের কারণ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং আযাব তোমাদের নিকটে এসে গেছে; কিন্তু কিছু দিন আমি তা পিছিয়ে দেব। ইউসুফ (আঃ)–এর কওমের ব্যাপারেও এমনিভাবে انا كشفنا عنهم العذاب বলা হয়েছে। অথচ তাদের উপর আযাবের লক্ষণাদি প্রকাশ পেয়েছিল মাত্র। আযাব আসার তখনও বিলম্ব ছিল। একেই كشف عذاب বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সারকথা এই যে, ধূম্রের ভবিষ্যদ্বাণীকে কেয়ামতের আলামত গণ্য করা হলে كَاشِفُوا الْعَذَابِ আয়াত দ্বারা কোন খটকা দেখা দেয় না এবং এ তফসীর অনুযায়ী نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ –এর অর্থ হবে কেয়ামত দিবসের পাকড়াও। আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের তফসীরকে বদর যুদ্ধের পাকড়াও বলা হয়েছে। এটাও স্বস্থানে শুদ্ধ। কারণ এটাও প্রবল পাকড়াও ছিল। কিন্তু এতে জরুরী হয় না যে, কেয়ামতে আরও প্রবল পাকড়াও হবে না। এটাও অবান্তর মনে হয় না যে, কোরআন পাক কাফেরদেরকে আলোচ্য আয়াতসমূহে এক ভাবী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছে। এরপর তাদের উপর যে কোন আযাব এসেছে, তাকেই তাঁরা এ আয়াতের প্রতীক মনে করে আয়তসমূহ উল্লেখ করেছেন। ফলে এটা যে কেয়ামতের আলামত, তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন স্বয়ং ইবনে-মসউদ থেকে বর্ণিত আছে—

وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ﴿٢٧﴾ كَذٰلِكَ ۖ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿٢٨﴾
فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ
نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿٣٠﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ ۚ اِنَّهٗ
كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ﴿٣٣﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ
لَيَقُوْلُوْنَ ﴿٣٤﴾ اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ﴿٣٥﴾
فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٦﴾ اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ اَهْلَكْنٰهُمْ ۖ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٣٧﴾ وَمَا
خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا
بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ
مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّلَا
هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٢﴾
اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ
فِي الْبُطُوْنِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ
الْجَحِيْمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٨﴾

(২৭) কত সুখের উপকরণ, যাতে তারা খোশগল্প করত। (২৮) এমনিই হয়েছিল এবং আমি এগুলোর মালিক করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। (২৯) তাদের জন্যে ক্রন্দন করেনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তারা অবকাশও পায়নি। (৩০) আমি বনী-ইসরাঈলকে অপমানজনক শাস্তি থেকে উদ্ধার করেছি। (৩১) ফেরাউন সে ছিল সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। (৩২) আমি জেনেশুনে তাদেরকে বিশ্ববাসীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম (৩৩) এবং আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম যাতে ছিল স্পষ্ট সাহায্য। (৩৪) কাফেররা বলেই থাকে, (৩৫) প্রথম মৃত্যুর মাধ্যমেই আমাদের সবকিছুর অবসান হবে এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না। (৩৬) তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে এস। (৩৭) ওরা শ্রেষ্ঠ, না তুব্বার সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা? আমি ওদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। ওরা ছিল অপরাধী। (৩৮) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি; (৩৯) আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশে সৃষ্টি করেছি; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না। (৪০) নিশ্চয় ফয়সালার দিন তাদের সবারই নির্ধারিত সময়, (৪১) যেদিন কোন বন্ধুই কোন বন্ধুর উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (৪২) তবে আল্লাহ্ যার প্রতি দয়া করেন, তার কথা ভিন্ন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী দয়াময়। (৪৩) নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ (৪৪) পাপীর খাদ্য হবে; (৪৫) গলিত তাম্রের মত পেটে ফুটতে থাকবে। (৪৬) যেমন ফুটে পানি। (৪৭) একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে, (৪৮) অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও,

ধূম্র দু'টি। একটি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। (অর্থাৎ, মক্কার দুর্ভিক্ষের সময়।) আর যেটি বাকী আছে, সেটি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে ভরে দেবে। এতে মুমিনের মধ্যে কেবল সর্দির অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং কাফেরের দেহের সমস্ত রন্ধ্র ছিন্ন করে দেবে। তখন আল্লাহ্ তাআলা ইয়ামনের দিক থেকে দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত করবেন, যা প্রত্যেক মুমিনের প্রাণ হরণ করবে এবং কেবল দুষ্ট প্রকৃতির কাফেরকুল অবশিষ্ট থাকবে।—(রুহুল-মা'আনী)

রুহুল মাআনীর গ্রন্থকার এই রেওয়ায়েতের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এটা প্রমাণিত হলেও কোরআন ও হাদীসের সাথে তাঁর অবলম্বিত তফসীরের কোন বৈপরীত্য থাকে না।

وَاِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ – (তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জন্যে আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার শরণাপন্ন হচ্ছি।) رجم শব্দের অর্থ প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা। এর অপর অর্থ কাউকে গালি দেয়াও হয়। এখানে উভয় অর্থই হতে পারে, কিন্তু প্রথম অর্থ নেয়াই অধিক সঙ্গত। কেননা, ফেরাউনের সম্প্রদায় মূসা [আঃ]-কে হত্যার হুমকি দিচ্ছিল।

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا –(সমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও।) মূসা (আঃ) সঙ্গীগণসহ সমুদ্র পার হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে কামনা করবেন যে, সমুদ্র পুনরায় আসল অবস্থায় ফিরে যাক, যাতে ফেরাউনের বাহিনী পার হতে না পারে। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বলে দিলেন, তোমরা পার হওয়ার পর সমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও এবং পুনরায় পানি চলমান হওয়ার চিন্তা করো না—যাতে ফেরাউন শুষ্ক ও তৈরী পথ দেখে সমুদ্রের মধ্যস্থলে প্রবেশ করে। তখন আমি সমুদ্রকে চলমান করে দেব এবং তারা তাতে নিমজ্জিত হবে।—(ইবনে-কাসীর)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ —(আমি এক ভিন্ন জাতিকে সেসবের উত্তরাধিকারী করে দিলাম।) সূরা শোয়ারায় বলা হয়েছে যে, এই 'ভিন্ন জাতি' হচ্ছে বনী ইসরাঈল। অবশ্য বনী ইসরাঈল পুনরায় মিসরে আগমন করেছিল বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সূরা শোয়ারার তফসীরে এর জওয়াবও দেয়া হয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন ঃ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ (অতঃপর তাদের জন্যে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করেনি।) উদ্দেশ্য এই যে, তারা পৃথিবীতে কোন সৎকর্ম করেনি যে, তাদের মৃত্যুতে পৃথিবী ক্রন্দন করবে এবং তাদের কোন সৎকর্ম আকাশেও পৌঁছায়নি যে, তাদের জন্য আকাশ অশ্রুপাত করবে। একাধিক রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, কোন সৎকর্মপরায়ণ বান্দার মৃত্যু হলে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। এরপর তিনি প্রমাণস্বরূপ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ আয়াতখানি তেলাওয়াত করেন। ইবনে-আব্বাস থেকেও এমনি ধরনের হাদীস বর্ণিত রয়েছে। — (ইবনে-কাসীর) শোরায়হ্ ইবনে ওবায়দ (রাঃ)-এর অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, প্রবাসে মৃত্যুবরণ করার দরুন, যে মুমিন ব্যক্তির জন্যে কোন ক্রন্দনকারী থাকে না, তার জন্যে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। এর সাথেও তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং বলেন, পৃথিবী ও আকাশ কোন কাফেরের জন্যে ক্রন্দন করে না। —(ইবনে-জরীর) হযরত আলী (রাঃ)-ও সৎলোকের

মৃত্যুতে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দনের কথা উল্লেখ করেছেন। — (ইবনে-কাসীর)

কেউ কেউ এ আয়াতকে রূপক অর্থে ধরে নিয়ে বলেন, এতে আকাশ ও পৃথিবীর প্রকৃত ক্রন্দন বোঝানো হয়নি ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অস্তিত্ব এমন অনুল্লেখযোগ্য দৃষ্টে এটাই অধিক সঙ্গত মনে হয় যে, আয়াতে আক্ষরিক অর্থেই ক্রন্দন বোঝানো হয়েছে। কেননা, এটা সম্ভবপর এবং রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত। কাজেই অহেতুক রূপক অর্থ নেয়ার প্রয়োজন নেই। এখন প্রশ্ন এই যে, আকাশ ও পৃথিবীতে চেতনা কোথায়? তারা ক্রন্দন করবে কেমন করে? জওয়াব এই যে, জগতের প্রত্যেকটি সৃষ্টবস্তুতেই কিছু না কিছু চেতনা অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ –আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমানুয়ে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হচ্ছে। তবে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন মানুষের ক্রন্দনের অনুরূপ হওয়া জরুরী নয়। তারা অবশ্যই অন্যভাবে ক্রন্দন করে, যার স্বরূপ আমাদের জানা নেই।

وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ –(আমি বনী-ইসরাঈলকে জেনে-শুনে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।) এতে উম্মতে-মোহাম্মদী অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠত্ব জরুরী হয় না। কেননা, এখানে তৎকালীন বিশ্ববাসী বোঝানো হয়েছে। তখন তারা নিশ্চিতই জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতি ছিল। এরই অনুরূপ কোরআনে হযরত মরিয়মকে বিশ্বের নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের কথা বলা হয়েছে। এটাও সম্ভবপর যে, বিশেষ কোন বিষয়ে বনী-ইসরাঈলকে সর্বকালের সর্বলোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে উম্মতে-মোহাম্মদীই শ্রেষ্ঠ। عَلَىٰ عِلْمٍ (জেনেশুনে)-এর উদ্দেশ্য এই যে, আমার প্রত্যেক কাজ প্রজ্ঞাভিত্তিক হয়ে থাকে। কাজেই প্রজ্ঞার দাবী অনুযায়ীই আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ –(আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলী দিয়েছি, যাতে প্রকৃষ্ট পুরস্কার ছিল।) এখানে লাঠি, দীপ্তিময় শুভ্র হাত ইত্যাদি মো'জেযা বোঝানো হয়েছে। عَلَىٰ عِلْمٍ শব্দের দু'অর্থ—পুরস্কার ও পরীক্ষা। এখানে উভয় অর্থ অনায়াসে সম্ভবপর।— (কুরতুবী)

فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ –(তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর)। এই আপত্তির জওয়াব সুস্পষ্ট বিধায় কোরআন পাক এর কোন জওয়াব দেয়নি। পরকালে মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবে বলে দাবী করা হয়েছে। দুনিয়াতে জন্ম-মৃত্যু আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ আইন ও উপযোগিতার অধীন। কাজেই আল্লাহ্ তাআলা কাউকে দুনিয়াতে পুনরুজ্জীবন দান না করলে পরকালেও দান করতে পারবেন না, এটা কেমন করে বোঝা যায়?—(বয়ানুল-কোরআন)

তুব্বার সম্প্রদায়ের ঘটনা ঃ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ – (তারা শৌর্য-বীর্যে শ্রেষ্ঠ, না তুব্বার সম্প্রদায়?) কোরআনে দুজায়গায় তুব্বার উল্লেখ রয়েছে—এখানে এবং সূরা ক্বাফে। কিন্তু উভয় জায়গায় কেবল নামই উল্লেখ করা হয়েছে—কোন বিস্তারিত ঘটনা বিবৃত হয়নি। তাই এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যে, এরা কোন জনগোষ্ঠী? বাস্তবে তুব্বা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়, বরং এটা ইয়ামনের হিমইয়ারী সম্রাটদের উপাধিবিশেষ। তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইয়ামনের পশ্চিমাংশকে রাজধানী করে আরব, শাম, ইরাক ও আফ্রিকার কিছু অংশ শাসন করেছে। تبع শব্দের বহুচন تبابعة ব্যবহৃত হয় এবং এই সম্রাটগণকে 'তাবাবয়ায়ে-ইয়ামন' বলা হয়। এখানে কোন সম্রাট বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে-কাসীরের বক্তব্য অধিক সঙ্গত মনে হয়। তিনি বলেন, এখানে মধ্যবর্তী সম্রাট বোঝানো হয়েছে, যার নাম 'আস'আদ আবু কুরায়েব ইবনে মালফিকারেব।' যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের কমপক্ষে সাতশ' বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। হিমইয়ারী সম্রাটদের মধ্যে তার রাজত্বকাল সর্বাধিক ছিল। সে তার শাসনামলে অনেক দেশ জয় করে সমরকন্দ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, এই দিগ্বিজয়কালে একবার সে মদীনা মুনাওয়ারার জনপদ অতিক্রম করে এবং তা করায়ত্ত করার ইচ্ছা করে। মদীনাবাসীরা দিনের বেলায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত এবং রাত্রিতে তার আতিথেয়তা করত। ফলে সে লজ্জিত হয়ে মদীনা জয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। এ সময়েই মদীনার দু'জন ইহুদী আলেম তাকে হুঁশিয়ার করে দেয় যে, এই শহর সে করায়ত্ত করতে পারবে না ; কারণ, এটা শেষ পয়গম্বরের হিজরতভূমি। সম্রাট ইহুদী আলেমদ্বয়কে সাথে নিয়ে ইয়ামন প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদের শিক্ষা ও প্রচারে মুগ্ধ হয়ে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য, তখন ইহুদী ধর্মই সত্য ধর্ম ছিল। অতঃপর তার সম্প্রদায়ও সত্য ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তারা আবার মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজা শুরু করে দেয়। ফলে তাদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হয়। সূরা সাবায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। (ইবনে-কাসীর) এ থেকে জানা যায় যে, তুব্বার সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরে পথভ্রষ্ট হয়ে আল্লাহ্র গযবে পতিত হয়েছিল। এ কারণেই কোরআনের উভয় জায়গায় 'তুব্বার সম্প্রদায়' উল্লেখ করা হয়েছে ; শুধু তুব্বা উল্লেখিত হয়নি। হযরত সহল ইবনে সা'দ ও ইবনে আব্বাসের রেওয়েতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন لاتسبوا تبعا فانه قد اسلم তোমারা তুব্বাকে মন্দ বলো না ; কারণ সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ –(আমি আকাশ ও পৃথিবী যথাযথ উদ্দেশেই সৃষ্টি করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না।) উদ্দেশ এই যে, বোধশক্তি ও চিন্তাশক্তি থাকলে আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃষ্টিসমূহ অনেক সত্য উদ্‌ঘাটন করে। উদাহরণতঃ এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলায় অপার কুদরত ও পরকালের সম্ভাব্যতা বোঝা যায়। কারণ, যে সত্তা এসব মহাসৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন, তিনি নিশ্চিতই এগুলোকে একবার ধ্বংস করে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। তৃতীয়তঃ এগুলোর মাধ্যমে শাস্তি ও প্রতিদানের প্রয়োজনীয়তাও বোঝা যায়। কারণ, পরকালের প্রতিদান ও শাস্তি না থাকলে সৃষ্টির সমগ্র কাণ্ডকারখানাই ভুণ্ডুল হয়ে যায়। পৃথিবী সৃষ্টির রহস্যই তো একে পরীক্ষাগার করা এবং এর পর পরকালের শাস্তি ও প্রতিদান দেয়া। নতুবা সৎ ও অসৎ উভয়ের পরিণতি এক হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। এটা আল্লাহ্র মাহাত্ম্যের পরিপন্থী। চতুর্থতঃ সৃষ্টিজগত চিন্তাশীলদেরকে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যে উদ্বুদ্ধও করে। কেননা, সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর বিরাট অবদান। কাজেই এ অবদানের কৃতজ্ঞতা স্রষ্টার আনুগত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা বান্দার অবশ্য কর্তব্য।

আলোচ্য আয়াতসমূহে পরকালের কতিপয় অবস্থা বিধৃত হয়েছে এবং নিয়ম অনুযায়ী কোরআন পাক জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের অবস্থা একের পর এক বর্ণনা করেছে।

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ –যাক্কুমের স্বরূপ সম্পর্কে সূরা ছাফফাতে কিছু জরুরী বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কোরআনের আয়াত থেকে বাহ্যতঃ জানা যায়, যাক্কুম কাফেরদেরকে